বুরহান ওয়ানির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

বিদ্রোহী কাশ্মীর

মন্থন সাময়িকী প্রকাশন

আমি বুরহানের লাশের অপেক্ষায় আছি। একজন জঙ্গি সাত বছরের বেশি বাঁচে না। বুরহান ইতিমধ্যে ছ–বছর কাটিয়ে দিয়েছে। তাই আমি জানি ওর সময় হয়ে গেছে।

তিনমাস আগেই এপ্রিলের মাঝামাঝি মুজফ্‌ফর আহমেদ ওয়ানি খবরের কাগজের লোকেদের কাছে ছেলের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। কী মর্মান্তিক! একজন পিতা তাঁর সন্তানের মৃত্যুর দিন গুনছেন।

শুক্রবার সেই লাশ ঘরে এল। মুজফ্‌ফর ওয়ানির অপেক্ষার অবসান হল।

বুরহান মুজফ্‌ফর ওয়ানি। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রাল তহসিলে শরিফাবাদ গ্রামে ছিল ওঁর বাড়ি। ঘন জঙ্গল আর উঁচু পাহাড়ে ঘেরা ১০৯টি গ্রামের মধ্যে একটি শরিফাবাদ। বুরহানের মায়ের নাম মাইমুনা মুজফ্‌ফর, বাবা মুজফ্‌ফর আহমেদ ওয়ানি। ওঁরা তিন ভাই এক বোন। দাদা খালিদ গত বছর আগস্ট মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। মা মাইমুনা প্রতি রবিবার গ্রামের মেয়েদের কোরান পড়ান। বাবার গল্পটা তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক।

গত ছ–বছর ধরেই এই পরিবার ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং ভারতীয় বড়ো মিডিয়ার টার্গেটের মধ্যে ছিল। এবছর জানুয়ারি মাসে মুজফ্‌ফর ওয়ানি একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন 'ইয়ুথ কী আওয়াজ' নামে একটি পত্রিকার সাংবাদিক মীর বসিত হুসেন–এর কাছে। ১৮ জানুয়ারি সেটি পোস্ট করা হয়েছিল ওই পত্রিকার ওয়েবসাইটে। তার কিছুটা শোনা যেতে পারে। (বন্ধনীর মধ্যে অংশগুলো মীর বসিত হুসেনের সংযোজন।) :

শেষবার যখন আমি জাতীয় সংবাদমাধ্যমে কথা বলেছিলাম (দিল্লির একটি মেইনস্ট্রীম সংবাদপত্র), আমি হতাশ হয়েছিলাম। আমার পুরো বয়ানটা ব্যবহার করা হয়নি। ওরা তার একটা অংশ ব্যবহার করেছিল। ... (সেই অংশটা ছিল) ইসলাম নৃশংসতা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জিহাদে যেতে তোমাকে অনুমোদন দেয়। আমার ছেলে নিজের জন্য সেই পথ নিয়েছিল। ... কিন্তু ওরা তার মূল কারণটাকে বাদ দিয়েছিল। আর সেটাই ইন্ডিয়া এখানে আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি করে চলেছে। এখানকার জনসমষ্টির প্রতি তাদের নীতিগুলোই জঙ্গিতার প্রকৃত কারণ। যে নিপীড়ন আর অপমানে যুবকেরা এখানে প্রতিদিন বিদ্ধ হয়, সেটাই তাদের বিদ্রোহী করে তোলে। ...

বুরহান মোটেই একমাত্র বা প্রথম নয়। এখানে আগুন আগেই লেগেছে। সেই আগুন নেভানোর জন্য জল দরকার, পেট্রল তো নয়। —— ওরা আমার বয়ানের এই অংশটা ছাপেনি।

যদি বন্দুক সহজেই পাওয়া যেত, তাহলে সিংহভাগ যুবকই সেগুলো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিত। (বয়ানের এই অংশটা ওরা বিকৃত করেছিল। যুবকেরা কেন এই পদক্ষেপের

দিকে যায়, সেই কারণের বর্ণনাটা মিডিয়া চেপে গিয়েছিল।) ... এখন সকলেই বলতে পারে যে আমি বন্দুকের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করছি। কিন্তু আমি মোটেই তা করছি না। আমি কেবল এর পিছনের কারণটা তুলে ধরতে চাইছি।

(মুজফ্‌ফরের এক ছেলে মারা গেছে, আরেক ছেলে জঙ্গি হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে) আমি নিজেকে এই বিশ্বাসে সান্ত্বনা দিই, শহিদ কখনও মরে না। ... প্রথমত, আমি তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। মাঝেমাঝে আমি অস্থির হয়ে উঠি, একদিন আমি দেখব বুরহান আর নেই। তখন আমি নিজেকে বুঝ দিই, আল্লাহ্‌ তো সব কিছু। আমি জানি আমার ছেলে খালিদ আল্লাহর সঙ্গে রয়েছে এবং বেঁচে রয়েছে। বুরহান কাছে নেই, আমি সেটা অনুভব করি। কিন্তু আমি জানি এই পথে যদি ওর মৃত্যু হয়, সে হবে একজন শহিদ। আর যদি আমি ভাবতে শুরু করি যে আমার ২৪ বছরের ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে এবং আরেকজন যে কোনোদিন প্রাণ দেবে, আমি জানি না তখন আমার কী দশা হবে। সংসারের সব কিছু সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। ...

বহুবার সেনা অফিসারেরা বুরহানকে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য আমার কাছে এসেছে। প্রথমত, বুরহানের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, আমার ছেলে আত্মসমর্পণ করবে না। একজন সেনা অফিসার আমাকে বলেছিলেন, বুরহান সারেন্ডার করলে ওকে ছ–মাস জেলে রাখা হবে। আরেকজন বলেছিলেন, ও অস্ত্র সমর্পণ করলে ওকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আমি আমার ছেলেকে যতটা চিনি, ও আত্মসমর্পণ করবে না। ...

ইসলামে দুটো জিনিস হয়, গাজি কিংবা শহিদ, আত্মসমর্পণ কেবল আল্লাহর সামনেই হতে পারে। ... বুরহান কোনো ব্যক্তিগত রাগের ঝাল মেটাতে ওই পথে যায়নি। যদি সেটা ব্যক্তিগত হত, একটা সমঝোতা হয়তো হতেও পারত। কিন্তু এটা ইসলামের বিষয়। এর কোনো সমঝোতা হয় না। ...

(সংবাদে বলা হয়েছে, ২০১০ সালে বুরহান এবং তাঁর প্রয়াত দাদা খালিদ নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের হাতে মার খেয়েছিল, খালিদ মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে যায়। সেইদিনই বুরহান প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু আচমকা এই ঘটনায় বুরহানের মানসিক পরিবর্তন আসেনি।) এখানে প্রায় প্রত্যেকেই সেনাদের হাতে মার খেয়েছে। সেটা তোমার প্রাপ্য আর পেতেই হবে তোমায়! কিন্তু মার খেয়ে সকলে তো জঙ্গি হয়নি। এটা নির্ভর করে একজন কতখানি নিতে পারে, এটা আপনার আত্মসম্মানের ওপর নির্ভর করে। কারও আত্মসম্মানে বারবার ঘা লাগে, তখন সে জবাব দেওয়ার কথা ভেবে নেয়। অন্যরা চুপচাপ থাকার কথাই ভাবে। আমার ছেলে অত্যাচার আর অপমান সইতে পারেনি, তাই সে সেই পথ বেছে নিয়েছে যে পথে এখন সে হেঁটে চলেছে। ...

(অন্য অনেকের মতোই মুজফ্‌ফর মনে করে, বুরহান বন্দুক হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। যদি সম্মানের সঙ্গে ফেরা যায়, সে একদিন ঘরে ফিরে আসবে।) এমন তো হতেও পারে যে ভারত আর পাকিস্তান কোনো সমঝোতার রাস্তায় আসবে একদিন, সেখানে আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে হুরিয়তের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। হয়তো তারা এমন কোনো নীতি তৈরি করবে যাতে বিদ্রোহীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। ... আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যাতে আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমাধান বেরিয়ে

আসে। আমরা শান্তি চাই। আমি চাই আমার ছেলে ঘরে ফিরুক, কিন্তু অবশ্যই সম্মান নিয়ে, শৃংখলিত হয়ে নয়। ...

কিন্তু ইন্ডিয়া যখন হুরিয়তকে ডাকছে না, তার মানে হল ওরা মীমাংসা চায় না। যদি ওরা আলোচনায় হুরিয়তকে অংশগ্রহণ করায়, তাহলে এনসি (ন্যাশনাল কনফারেন্স) আর পিডিপি (পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক পার্টি)–র গদি চলে যাবে। এখানে তিনটে স্টেকহোল্ডার আছে আর থাকবেও বটে — ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর কাশ্মীর। এই তিনপক্ষকেই অংশগ্রহণ করাতে হবে। দুই পক্ষ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবে না। আমাদের এর অংশীদার করতে হবে। ...

(২০১৪ সালে বারাক ওবামা যখন নয়া দিল্লিতে এলেন, মুজফ্‌ফর এবং তাঁর প্রয়াত সন্তান খালিদকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল। কোথায় দিল্লি আর কত মাইল দূরে ত্রাল! গতবছর নরেন্দ্র মোদি যখন এখানে এসেছিলেন, তখনও এটা ঘটল।) ২০১০ সালের পর থেকে, বিশেষত ২০১২–তে আমাকে বহু ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। যখনই জঙ্গিরা কোথাও কিছু ঘটিয়েছে, পুলিশ আমাকে আটক করেছে। একদিন একজন অচেনা মানুষ পুলিশের কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছে, ওরা আমাকে আর খালিদকে পাঁচদিন আটকে রাখল। ওবামা দিল্লিতে এলেন আর খালিদ গ্রেপ্তার হয়ে গেল! ও পরীক্ষা দিতে পারল না। ... এক সরপঞ্চ গুলি খেয়ে মরলেন, আবার আমি আর খালিদ জেলে চলে গেলাম। নির্বাচনের সময় (পার্লামেন্ট আর বিধানসভা দুটোতেই) আমাদের আটক করে রাখা হয়েছে। বছরে গড়ে দু–মাস করে খালিদকে জেলে কাটাতে হয়েছে। বেশিরভাগ সময় ওরা আমাদের ত্রাল পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেত, কখনও কখনও নিয়ে যেত অবন্তীপুরা পুলিশ স্টেশনে। ... মোদির কাশ্মীর সফরের সময় আমাকে ওরা দুদিন আটকে রাখল, বিভিন্ন মসজিদের ইমামদেরও গ্রেপ্তার করা হল। কেন? আমরা মসজিদে ইসলাম নিয়ে চর্চা করি। তাই আমার মনে হয়, ইমামদের আটক করে ওরা ইসলামের ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। ...

সরকার আমাকে দূরের একটা জায়গায় বদলি করে দিল। আমি জনসাধারণের চাহিদাতে এখানকার (ত্রালের) হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছিলাম। ঠিক তিনদিন পর আমাকে শোপিয়ান জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হল, সেটাও এক প্রত্যন্ত গ্রামে। কেন? কারণ আমি বুরহানের বাবা। এখন দু–বছর পর আমি এখানে ফিরে এসেছি। এই বদলির জন্য আমার খুব অসুবিধা হয়েছে। ...

ওরা (পুলিশ) যখন তখন আমাদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এটা আমাদের এক রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন আর এ নিয়ে আমাদের সমস্যা হয় না। এটা ওদের কাজ। কিন্তু যখন অকারণে ওরা আমাদের আটকে রাখে, খালিদকে হেনস্থা করে, এমনকী আমাকেও ছাড়ে না, এতে আমাদের প্রত্যেকের মানসিক অসুবিধা হয়। ওরা হয়তো এক হাজার বার আমাদের ঘরে তল্লাশি চালিয়েছে। শুধু ঘরগুলোই নয়, ঘরের দেওয়ালগুলোও পরীক্ষা করে দেখে কোথাও কিছু লুকোনো আছে কিনা। ...

(মিডিয়া এবং লোকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বুরহানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।) লোকে যখন বুরহানকে নিয়ে বড্ডো বেশি কথা বলে, যেন ও–ই লড়াইটা শুরু করেছে। আমি সবসময় বলে এসেছি, বুরহান এই পথে প্রথম নয়। ... আমি টেলিভিশিনের নিউজ চ্যানেলে ওর প্রথম ভিডিওটা দেখেছিলাম, ওরা ইন্ডিয়ার প্রতি বুরহানের কথাগুলো

তরজমা করে দিচ্ছিল। ১৯৮৯ সাল থেকে কাশ্মীরিরা ভারত থেকে স্বাধীনতা চাইছে। এটা কেবল বুরহানের লড়াই নয়। সারা কাশ্মীরের এটা বাসনা। বুরহান তাদেরই একজন। যদি আমরা অতীতের দিকে তাকাই দেখতে পাব, শ্রীনগর সোপোর অনন্তনাগ এবং অন্যান্য জেলায় কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এক লক্ষের বেশি মানুষ মারা গেছে। তারা কী খুঁজছিল? আজাদি। এমনকী বিচ্ছিন্নতাবাদী (সৈয়দ আলি শাহ) গিলানি, মীরওয়াইজ (উমর ফারুক), (ইয়াসিন) মালিক, (শাবির) শাহ কী চেয়েছেন? একই জিনিস। ওঁদের পথটা ছিল আলাদা। ওঁদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রথমে বন্দুক হাতে নিয়েছিলেন। এখন ওঁরা রাজনৈতিকভাবে লড়ছেন। কিন্তু সর্বোপরি, লক্ষ্যটা একই। যখন এসব শুরু হয়েছিল, বুরহানের জন্ম হয়নি। ...

মুফতি মহম্মদ সঈদ যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেন, খালিদ ছিল প্রথম নাগরিক যাকে হত্যা করা হয়েছিল। (এই সাক্ষাৎকারের আগে সঈদ মারা গেছেন।) সেইসময় আমরা ভেবেছিলাম যে একটা নতুন সরকার এসেছে, মুফতি হয়তো কিছু করতেও পারেন। ... পিডিপির থেকে আমরা কিছু আশা করেছিলাম। হয়তো ন্যাশনাল কনফারেন্সের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি। কিন্তু বর্তমান সরকারে এসে তারা যে ভূমিকা নিল তাতে এনসি–র সীমাকেও ছাড়িয়ে গেল তারা। এনসি–ও নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু এদের মতো নয়। এখন মুসলমানদের কোনো মূল্যবোধ নেই।

(দিল্লির ওই সংবাদপত্রকে প্রয়াত মুফতি বলেছিলেন, ছেলেদের বন্দুক ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।) ওদের রাজনীতি ওদের ব্যাপার। যদি এখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, একটা নতুন 'জামাত' বিজয়ী হয়ে সামনে আসবে। তারা হয়তো রাজনীতিবিদও নয়, কিন্তু অচেনা নতুন মুখ। পিডিপি আর এনসি–র কাজ হল পরস্পরের বিরোধিতা করা।

৮ জুলাই ২০১৬ শুক্রবার সেনাবাহিনীর জওয়ানদের হাতে বুরহান মুজফ্‌ফর ওয়ানির মৃত্যু হয়েছে। ছ–মাস আগে তার বাবা এই কথাগুলো বলেছিলেন। বুরহান মাত্র পনেরো বছর বয়সে আজাদির লড়াই করতে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে যোগ দিয়েছিল 'জঙ্গি' হিসেবে পরিচিত হিজবুল মুজাহিদিন সংগঠনে। প্রায় তিন দশক ধরে কাশ্মীরে চলছে এই আজাদির লড়াই। বুরহানের আগের প্রজন্মের বেশিরভাগ 'জঙ্গি' আন্দোলনকারীরা মুখ ঢেকে আড়ালে আবডালে চোরাগোপ্তাভাবে লড়াই করত। তাদের লোকে ব্যাপকভাবে চিনত না। তাদের মৃত্যু হলে অথবা তাদের হত্যা করার পর সেনাবাহিনী তাদের নাম ও ছবি প্রকাশ করত, মিডিয়ায় তা স্থান পেত। ক্রমশ কাশ্মীরে সেই পুরোনো জমানার জঙ্গিতার জনপ্রিয়তা কমছিল। জঙ্গি দলেও নতুন যুবকদের যোগদান কমে গিয়েছিল। এমনকী যারা প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আজাদির লড়াই করে — যেমন জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট বা হুরিয়ত কনফারেন্সের বিভিন্ন গোষ্ঠী — জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। অবশ্য গোপন জঙ্গিদের নিয়েই রাষ্ট্রের মাথাব্যথা বেশি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৪ জুলাই ২০১৬), কাশ্মীর উপত্যকায় ২০১৬–র জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে নতুন জঙ্গি রিক্রুট হয়েছে ৩৯ জন; ২০১৫ সালে ছিল ৭৬ জন, ২০১৪–তে ৫৬ আর ২০১৩–তে ২০ জন। পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গির একটা পরিসংখ্যানও তারা প্রকাশ করেছে, ২০১৬–র জানুয়ারি থেকে ১ জুন পর্যন্ত ৩৬ জন, ২০১৫–তে ৩৩ জন আর ২০১৪–তে ৬৫ জন। সংখ্যাটা মোটেই আজাদির লড়াইয়ের দিক থেকে আশাব্যঞ্জক নয়। অথচ মিডিয়া গল্প তৈরি করতে ব্যস্ত, কাশ্মীরে সশস্ত্র জঙ্গিদের নতুন স্রোত দৃশ্যমান! পরিসংখ্যান কিন্তু তা দেখাচ্ছে না।

অন্যদিকে যদি আমরা তাকাই, প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার জন্য হাজার হাজার কাশ্মীরি যুবক–যুবতী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছে। দক্ষতা ও যোগ্যতার জোরে চাকরির বাজারেও তাদের উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শুধুমাত্র জেএনইউ বা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বিভিন্ন রাজ্যের নামি–অনামি বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা পড়তে যাচ্ছে, গবেষণা করতে যাচ্ছে।

বুরহান ওয়ানি এই নতুন প্রজন্মের স্বাধীনতা–সংগ্রামী। সে ছিল জঙ্গি, হিজবুল মুজাহিদিনের সদস্য। আর সেটা সে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেছিল সোশাল মিডিয়ায়। এক সুদর্শন প্রাণোচ্ছল যুবক, তার গায়ে যোদ্ধার কমব্যাট ইউনিফর্ম, দু–কাঁধে অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে বুরহানের সেই ছবি দেখা যেত সোশাল মিডিয়ার পোস্টে, ভিডিওতে। সেই পরিসর থেকে সে আজাদির লড়াইয়ে আহ্বান জানাতো যুবকদের। তার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবেদনে 'হিন্দুস্তান টাইম্‌স' লিখেছে, 'হিজবুল মুজাহিদিন কমান্ডার, যাকে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে, সেই বুরহান

ওয়ানির উত্থানের সঙ্গে জুড়ে গেছে এক দশকেরও বেশি সময় পর বহু কাশ্মীরি যুবকের জঙ্গি দলে ফিরে আসা।'

পরিস্থিতির এই বদলের সঙ্গেই রয়েছে সোশাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তার বিষয়টি। অতীতে গোপন জঙ্গি দলের কর্মীদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ ওয়াকিবহাল থাকত না বললেই চলে। কিন্তু এখন ফেসবুক, হোয়াট্‌স অ্যাপ, টুইটার এবং বেশ কিছু ব্লগের মধ্য দিয়ে নামজাদা সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে বুরহান ওয়ানির মতো দক্ষিণ কাশ্মীরের এক অখ্যাত গ্রামের ছেলেও বহু মানুষের, বিশেষত কমবয়সিদের নজরের মধ্যে চলে এসেছে। দৈনন্দিন দৃশ্যমান জগতের চলাফেরার মধ্যে তার কোনো প্রকাশ নেই। অথচ সোশাল মিডিয়ার পরিসরে পারস্পরিক দেওয়া–নেওয়া, মত–বিনিময়, সংলাপের মধ্য দিয়ে একটা সংশ্লেষ চলতে থাকে। বুরহান ওয়ানির মতো সামান্য একজন যুবক হয়ে ওঠে সমস্ত কাশ্মীরির কাছে আজাদির লড়াইয়ের সাহসী বীরের এক নতুন ভাবমূর্তি।

ছবিতে বুরহানের দু–কাঁধে বন্দুক থাকলেও সে কিন্তু কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ বা হত্যায় লিপ্ত হয়নি। একথা জানিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লা টুইটারে : 'আমার জমানায় বুরহানের সমস্ত সোশাল মিডিয়া কার্যকলাপে আমি তার কোনো জঙ্গি ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারি না। তার পরে কী ঘটেছে আমি নিশ্চিত নই' (@abdullah_omar, July 8, 2016)। ওমর অবশ্য পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন এবং একটু বেশি কথাই এখন বলছেন। কিন্তু ৯ জুলাই নিজের ফেসবুক পোস্টে বারামুল্লার সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ ইমতিয়াজ হুসেন বলেছেন, '... সত্য হল, কার্যত তার সমস্ত সাহসিকতা সত্ত্বেও, সে একজন পোস্টার বয় হওয়া সত্ত্বেও, নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে সে একটাও অ্যাকশন চালাতে পারেনি। তার জীবন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল মিডিয়ার ক্ষমতায় এবং তার মৃত্যুও সেইভাবেই উদ্‌যাপিত হয়েছে ... সেইসব জনসাধারণের দ্বারা যারা খেলার মাঠে সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে থাকে আর উল্লাসে চিৎকার করে।'

ইমতিয়াজ হুসেনের বক্তব্যে একটা অবজ্ঞা থাকলেও একটা সত্য উচ্চারিত হয়েছে, বুরহান কোনো সশস্ত্র অ্যাকশন করেনি। তাহলে ওকে হত্যা করা হল কেন এবং কীভাবে? ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় বুরহানের মৃত্যুর পরে দক্ষিণ কাশ্মীরের একজন পুলিশ অফিসার বলেছেন, 'বুরহানকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা মত ছিল ওকে হত্যা করার বিরুদ্ধে। সেটা গুরুত্ব পায়নি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে ওর হত্যাকাণ্ড যুবসমাজের মধ্যে অনেকটা ক্ষোভ সৃষ্টি করবে এবং স্থানীয় জঙ্গি রিক্রুটমেন্ট যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ওকে গ্রেপ্তার করলে এতটা হত না। যেটা বুরহান শুরু করেছিল তা ওর মৃত্যুর পরেও থামবে না। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার হতে পারে।'

বুরহানের বাবাও অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি বুরহানের মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছেন। অন্যত্র তিনি এটাও বলেছিলেন যে 'বুরহান হয়তো শীঘ্রই নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে প্রাণ দেবে'। সোশাল মিডিয়ায় বুরহানের জনপ্রিয়তার ফলে তার ডাকে সাড়া দিয়ে কমপক্ষে ত্রিশজন যুবক বিদ্রোহী দলে নাম লিখিয়েছিল। অন্যদিকে ন্যাশনাল মিডিয়া তাকে হিরো বানিয়ে তুলেছিল। তার বাড়িতে দিল্লির বড়ো সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিল। অতএব পুলিশের খাতায় সে হয়ে উঠল একজন 'হার্ডকোর মিলিট্যান্ট'। তার মাথার ওপর রাষ্ট্র ১০ লক্ষ টাকা ইনাম ঘোষণা করল। তার দাদা খালিদকে সেনাবাহিনী হত্যা করল, যে তখন স্নাতকোত্তর স্তরে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনা করছিল। মুজফ্‌ফর সেইসময় বলেছিলেন, 'বুরহানকে সরকার টার্গেট করেছে, এটা মানতে পারি। সে নিজের জন্য একটা পথ বেছে নিয়েছে। সরকারের তো বিশাল বাহিনী রয়েছে। যদি ওরা পারে, ওকে হত্যা করুক। কিন্তু খালিদ ওদের কী করেছে? বুরহানের দাদা বলেই ওকে হত্যা করা হল।'

৮ জুলাই শুক্রবার কোকেরনাগের বান্দুরা গ্রামে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর পুলিশ ও ১৯ রাষ্ট্রীয় রাইফেলের একটি যৌথ দল বুরহান ওয়ানি, সরতাজ আহমেদ শেখ এবং পারভেজ আহমেদ লস্করিকে হত্যা করে। সরকার ঘোষণা করেছে যে 'এনকাউন্টার' বা মুখোমুখি সংঘর্ষে এদের মৃত্যু হয়েছে। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সওয়া ছ-টার মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে এবং স্থানীয় মানুষ পাথর ছুঁড়ে সেনাবাহিনীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

বুরহান ওয়ানি নিহত হওয়ার পর

শুক্রবার রাত থেকেই দক্ষিণ কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুবকেরা বুরহানের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পরদিন দুপুর তিনটেয় ত্রালের ইদগাহতে জানাজার প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। ৪.৫ একর জুড়ে ইদগাহ, সেখানে জায়গা দিতে না পারায় তিন দফায় প্রার্থনা করা হয়। আনুমানিক লক্ষাধিক মানুষ এতে যোগ দেয়।

শনিবার থেকেই উপত্যকায় মোবাইল ইন্টারনেট সার্ভিস বন্ধ রাখা হয় এবং বহু এলাকায় কার্ফু জারি করা হয়। কিন্তু উপত্যকা জুড়ে, বিশেষত দক্ষিণ কাশ্মীরের ত্রাল, পুলওয়ামা, শোপিয়ান, বিজবেহারা ইত্যাদি এলাকায় হাজার হাজার যুবক কার্ফু উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে পড়ে। হাতে পাথর নিয়ে ছুঁড়তে থাকা এই বিদ্রোহী যুবকদের ওপর সমস্ত জায়গায় লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস এবং বেশ কিছু জায়গায় গুলি বর্ষণ করে চলে নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশ-সিআরপিএফ এবং বিশাল সংখ্যক প্রতিবাদী যুবকদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের ঘটনা ঘটতে থাকে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান, রাজপুরা, হল পুলওয়ামা, লিটার, তাহাব পুলওয়ামা, তাঞ্চিবাঘ পাম্পোর, দামহাল, সঙ্গম, জাইনাপোরা, কোইমো, ইয়ারিপোরা, বেহিবাঘ কুলগাম, ভাইলু, ওয়ারপোরা সোপোর, টিকিপোরা সোগাম, লালপোরা কুপওয়ারা, কানইয়াল বাগ বারামুল্লা, আর্মপোরা সোপোর, তারজু, বাতামালু, কামরিয়া গান্দেরবাল, সইবাঘ বুদগাম, মিরগুন্দ, সেইকপোরা এবং শ্রীনগরের বহু এলাকায়।

নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে সরাসরি মৃত্যুর পাশাপাশি জখম হয়ে পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় অনেকের। অনন্তনাগের সঙ্গম-এ পুলিশের একটি বাঙ্কার গাড়িকে ঠেলে ঝিলম নদীর জলে ফেলে দেয় প্রতিবাদীরা। ড্রাইভার আফরোজ আহমেদ মারা যান। পুলিশ থানা, সিআরপিএফ চৌকি ও প্রশাসনিক ভবনে দলবদ্ধ এবং কোথাও কোথাও সশস্ত্র হামলাও চলে।

যুবকদের এই বিদ্রোহ চলতে থাকে একটানা। ক্রমে তা কিছুটা স্তিমিত হলেও সাতদিন পরেও তার আগুন নেভেনি।

শনিবারই সৈয়দ গিলানী, উমর ফারুক, সাবির শাহ, নঈম খান, আসরাফ সেহরাজ, আয়াজ আকবর সহ 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে পরিচিত নেতৃবৃন্দকে গৃহবন্দী করে সরকার। এটাই হল এখানকার অলিখিত নিয়ম! উপত্যকায় কোনো অশান্তি দেখা দিলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের গৃহবন্দী করা হয়। তারপর জনবিক্ষোভ শান্ত হলে অথবা দমন করে শান্ত করার পর সাধারণত সপ্তাহখানেক পর তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ওই নেতারাও অশান্তির সময় পুলিশের গুলিতে নিহত যুবকদের বাড়ি গিয়ে আত্মীয়-পরিজনদের সান্ত্বনা দিয়ে আসে, কিছু বিবৃতি দেয়, ইত্যাদি। এটাই বহু বছর ধরে চলে আসছে।

যেখানে মোতায়েন এবং অতিরিক্ত মজুত সহ কাশ্মীর উপত্যকায় সামরিক এবং আধা–সামরিক বাহিনীর প্রায় পাঁচ লক্ষ জওয়ান রয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার আরও ৮০০ সিআরপিএফ জওয়ান কাশ্মীরে পাঠাচ্ছে।

জম্মু কাশ্মীর কোয়ালিশন অব সিভিল সোসাইটি নামে এক সুপরিচিত মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, শুধু প্রতিবাদী জনতার ওপরই নয়, বিভিন্ন জায়গায় আহতদের চিকিৎসা চলাকালীন রোগী, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপরও হামলা চালিয়েছে সিআরপিএফ এবং পুলিশ। শনিবার থেকে সোমবার — এই তিনদিনে অন্তত চারবার পুলিশ ও সিআরপিএফ হাসপাতালে তল্লাশি চালিয়েছে।

বিদ্রোহের সপ্তমদিনে সরকার জানায়, এপর্যন্ত যে ৩৮ জন মারা গেছে, এদের মধ্যে একজন পুলিশ কাশ্মীরে। অনন্তনাগ, কাইমোহ, পুলওয়ামা, পামপোর এবং থাকে। এপর্যন্ত বিভিন্ন মোট ১৬৪০ জন চিকিৎসা করা হয়েছে।

এবং ৩৬ জনই দক্ষিণ বিজবেহরা, কুলগাম, শোপিয়ান, অবন্তীপুরা, কাকপোরায় কার্ফু জারি সরকারি হাসপাতালে আহত ব্যক্তিকে এদের মধ্যে ১৩৪ জন হাসপাতালে এসেছিল চোখে শটগান থেকে ছোঁড়া ছড়রা বুলেটের আঘাত নিয়ে। । এছাড়া বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে ১৫০০ জনের বেশি নিরাপত্তা রক্ষী আঘাত পেয়েছে এবং তাদের চিকিৎসা করা হয়েছে। ১৪ জুলাই সিআরপিএফ–এর স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল এস এন শ্রীবাস্তব জানান, 'আমরা জনসাধারণের ব্যাপক প্রতিবাদের মোকাবিলা করছি, কিন্তু ছররা গুলি (পেলেট) সহ কেবলমাত্র অ–প্রাণনাশক অস্ত্র আমরা ব্যবহার করছি যাতে মানুষের মৃত্যু এড়ানো যায়।'

অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আই সার্জেন্টদের যে দল পাঠানো হয়েছে, তার প্রধান, ডা. সুদর্শন খোখার জানিয়েছেন, 'এখানে একটা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি। আমরা এই মাত্রায় আঘাত কোথাও দেখিনি' এই চিকিৎসকদের মতে, যারা চোখে পেলেট গুলির আঘাত পেয়েছে, তাদের সত্তর থেকে আশি শতাংশ স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে না। কিন্তু এত মানুষ চোখে আঘাত পেল কীভাবে? স্পষ্টতই শরীরের ঊর্দ্ধাঙ্গ লক্ষ্য করেই গুলি চালিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে যখন কিশোর–যুবকেরা হাতে নুড়ি–পাথর নিয়ে পথে নেমেছিল, তখন থেকেই এই ছররা গুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে ফৌজিরা। অ–প্রাণনাশক অস্ত্র ব্যবহারের যুক্তিতে এই ছররা গুলির ব্যবহার বাস্তবে চূড়ান্ত অমানবিক হয়ে উঠেছে। শিশুরাও রেহাই পায়নি। চার বছরের এক ছোট্ট মেয়ের চোখও বিদ্ধ হয়েছে এই গুলিতে।

বুরহান এই পথে প্রথম নয়

বুরহানের বাবা মুজফ্ফর আহমেদ ওয়ানি বলেছিলেন, মিডিয়া অপ্রয়োজনীয়ভাবে বুরহানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। তিনি এটাও বলার চেষ্টা করেছিলেন, 'বুরহান এই পথে প্রথম নয়'। মনে হয়, তাঁর এই কথার অর্থ না বুঝলে তামাম কাশ্মীরি মনকে বোঝা যাবে না।

কেন আজ পর্যন্ত সমস্ত কাশ্মীর জুড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি শ্লোগান : 'হম কেয়া চাহতে? আজাদি।' এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার নিষ্পত্তি হয়নি। আমাদের ভারত রাষ্ট্রে যাঁকে জাতির পিতা বলে সম্বোধন করা হয়, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে যাঁর চশমাকে এই স্বচ্ছতার অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেই মহাত্মা গান্ধী ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট বলেছিলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে সর্বোচ্চ আইন হল কাশ্মীরিদের ইচ্ছা। ... সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী কাশ্মীরিদের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। যত শীঘ্র এটা হয়, ততই ভালো।'[১] তৎকালীন দেশনেতারা কাশ্মীরিদের স্বশাসনের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। এরপর ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ভারত–পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রসংঘের কমিশন প্রস্তাব দেয়, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত বা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে সেখানকার জনগণের গণভোট করতে হবে। এরপর ১৯৫৩ সালের ২০ আগস্ট দুই দেশের পক্ষে জহরলাল নেহরু ও মহম্মদ আলি বোগরা যুক্ত বিবৃতি দেন, 'কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি গণভোটের মাধ্যমে স্থির হবে।'[২] তারপর একের পর এক ঘটনায় যখন ভারত সরকার তাদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, ১৯৮৯ সালে কাশ্মীর জুড়ে শুরু হয় এই আজাদির লড়াই।

বুরহানের বাবা মুজফ্ফর ওয়ানি তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই আজাদির লড়াইয়ে আজ পর্যন্ত কাশ্মীরে 'এক লক্ষ মানুষ মারা গেছে'। আজ বিশ্বের সবচেয়ে ঘন সামরিকীকৃত অঞ্চল হল কাশ্মীর উপত্যকা। প্রতি ১৫ জন পিছু একজন সশস্ত্র ফৌজ সেখানে মোতায়েন রয়েছে। সর্বমোট সংখ্যাটা প্রায় ৭০,০০০। ঘর থেকে বেরিয়ে দু–পা হাঁটলেই ফৌজির বেয়নেটের সামনে পড়তে হয়। বুরহান এবং তার দাদা মোটরবাইকে চেপে খাবার কিনতে গিয়ে ফৌজিদের কবলে পড়েছিল। ওরা তাদের সিগারেট কিনে এনে দিতে বলে। সিগারেট কিনে এনে দেওয়ার পর তাদের মারধোর করে। মুজফ্ফর বলেছেন, 'এখানে প্রায় প্রত্যেকেই সেনাদের হাতে মার খেয়েছে। সেটা তোমার প্রাপ্য আর পেতেই হবে তোমায়!'

---

১ সূত্র : ডকুমেন্টস অন কাশ্মীর প্রবলেম, এম এস দেওরা এবং আর গ্রোভার সম্পাদিত।
২ সূত্র : একই।

মার খেয়ে সকলেই বুরহানের মতো জঙ্গি হয় না বটে। কিন্তু অত্যাচার ও অপমানের নানান ঘটনায় বারবার উপত্যকা জুড়ে ফেটে পড়ে জনবিদ্রোহ। যেমনটা ঘটেছিল ২০১০ সালে। ৩০ এপ্রিল কুপওয়ারা জেলার মাচিল এলাকায় তিনজন যুবককে অপহরণ করে আনে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এবং তাদের ভারত–পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জঙ্গলে নিয়ে এসে হত্যা করে। তারা এই ঘটনাকে পাকিস্তানি জঙ্গি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে 'এনকাউন্টার' বলে ঘোষণা করে। এই মিথ্যাচার ধরা পড়ে যেতেই যুবকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশ ব্যাপক দমন–পীড়ন শুরু করে। ১১ জুন সাইদা কাদাল এলাকার যুবক ১৭ বছর বয়স্ক তুফেল আহমেদ শ্রীনগরের রাজৌরি কাদালে পুলিশের ছোঁড়া কাঁদানে গ্যাসের শেল ফেটে মারা যায়। এর থেকে শুরু হয় গণবিক্ষোভ। পুলিশ আর নিরাপত্তা রক্ষীরা লাঠিচার্জ করে, স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরবাড়ির জানলার শার্সি ভেঙে দেয়, তাদের উত্ত্যক্ত করে। তখন কমবয়সি কিশোর–ছেলেদের হাতে উঠে আসে রাস্তার ধারে জমে থাকা নুড়ি–পাথরের টুকরো। এইভাবে গড়ে উঠেছিল ছোটোদের 'পাথর ছোঁড়া' প্রতিরোধ আন্দোলন। কোনো দল, কোনো হুরিয়ত কনফারেন্স, কোনো হিজবুল মুজাহিদিনের নেতাদের এই আন্দোলনে প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়ে মহল্লায় মহল্লায়। সরকারি হিসেবে শতাধিক কিশোরের মৃত্যু হয়। অবশেষে চাপের মুখে কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্ত নেয় সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ। বিচারে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে ওই তিনজন নিরপরাধ যুবককে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত পাঁচজন সেনা–কর্মীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

আজ বুরহানের মৃত্যুর পরেও উপত্যকা জুড়ে যেভাবে আজাদির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে, সেটাও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা টুইটারে লিখেছেন, 'অনেক বছর পর আমি 'আজাদি'র শ্লোগান শুনছি, মসজিদ থেকে আপটাউন শ্রীনগর এলাকায় তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে' (@abdullah_omar, July 9, 2016)। কাশ্মীরে একটা অডিও–ক্লিপিং প্রচারিত হয়েছে, তাতে শোনা যাচ্ছে, বুরহানের মা চেঁচিয়ে বলছেন, 'তুম কিতনে বুরহান মারোগে?' জনতা জবাব দিচ্ছে, 'হর ঘর সে বুরহান নিকলেগা। ... আগে বাঢ়ো, হাম তুমহারে সাথ হ্যায় ... জিভে জিভে পাকিস্তান ...।' হ্যাঁ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগানও উঠছে। আজাদির লড়াই কখনও কখনও ভয়ানক দমন–পীড়নে কোনঠাসা হয়ে পাকিস্তানের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু লড়াইটা আজাদির। পাকিস্তানও কাশ্মীরের আর এক অংশ কয়েদ করে রেখেছে ভারতেরই কায়দায়। সম্প্রতি ২০ জুন ২০১৬ জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভাতে আওয়ামি ইত্তিহাদ পার্টির বিধায়ক শেখ রশিদ বলেছেন, কাশ্মীরকে ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' বা পাকিস্তানের 'স্কন্ধের ধমনি' বলে চালিয়ে দেওয়া চলবে না, রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণভোট করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ... আমাকে যদি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, নির্বাচনে না

দাঁড়াতে দেওয়া হয় কিংবা ফাঁসি দেওয়া হয়, তাহলেও কাশ্মীর বিষয়ে আমার এই অবস্থান পাল্টাবে না।[৩]

যখন কাশ্মীরে 'পাথর ছোঁড়া' আন্দোলন চলছে, সেইসময় জম্মু থেকে প্রকাশিত 'কাশ্মীর টাইম্‌স' পত্রিকার তৎকালীন প্রধান সম্পাদক, বর্তমানে প্রয়াত, বেদ ভাসিন মন্থন সাময়িকী পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'এই যুবকেরা নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করেছে। তাদের কোনো নেতা নেই। পুরোনো নেতারা কীভাবে তাদের নেতৃত্ব দেবে? তারা তো সব বন্দি কিংবা তাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত। ... ভারত সরকার নেতাদের শেষ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু তাদের চিন্তাকে শেষ করে দিতে পারেনি। মানুষ এখন এই যে আন্দোলন করছে, যার কোনো নেতা নেই। কিন্তু পুরোনো নেতাদের চিন্তা–আদর্শটা এই আন্দোলনে ফিরে এসেছে : স্বাধীনতা।' আজও বুরহানের বাবার কথায় আমরা বেদ ভাসিনের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু না বিচার–বহির্ভূত হত্যা?

বুরহানকে যেদিন হত্যা করে সেনাবাহিনী, সেদিনই দেশের সর্বোচ্চ আদালত মণিপুরের ১৫২৮ জন বিচার–বহির্ভূত হত্যার শিকার পরিবারগুলোর আবেদনের ওপর একটি রায় ঘোষণা করে। ৮৫ পৃষ্ঠার এই রায়ে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, 'এতে কিছু আসে যায় না যে আক্রান্ত একজন সাধারণ মানুষ অথবা একজন জঙ্গি কিংবা একজন সন্ত্রাসবাদী, এটাও ধর্তব্য নয় যে আক্রমণকারী একজন সাধারণ মানুষ না রাষ্ট্র ছিল। আইন উভয়ের জন্য সমান এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। ... এটা একটা গণতন্ত্রের অবশ্যপূরণীয় শর্ত এবং আইনের শাসনের রক্ষার জন্য তা প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়।' এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছিল যে 'উপদ্রুত এলাকা'য় একজন অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে আর্মি অ্যাক্টের ৩(দশম) ধারায় শত্রু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তিকে বাতিল করে জানায়, 'এমনকী এই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির বিচার–বহির্ভূত হত্যার অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখা হবে অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে দেখা হবে যাতে প্রকৃত ঘটনা নিশ্চিত ও নির্ধারণ করা যায়।'

মণিপুরে যে 'উপদ্রুত এলাকা' আইন এবং 'সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন' (AFSPA) জারি রয়েছে, কাশ্মীরেও তা বলবৎ। মণিপুরেও এই ১৫২৮ জনের হত্যাকাণ্ডকে এনকাউন্টার অর্থাৎ পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ

৩ সূত্র : দ্য স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা, ২১ জুন ২০১৬।

বলে দাবি করেছিল ভারত সরকার। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত তিন সদস্যের কমিশন ছ-টি আলাদা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে ২০১৩ সালের ৪ এপ্রিল জানায়, কোনোটিই এনকাউন্টার ছিল না।

মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু না বিচার-বহির্ভূত হত্যা? বুরহানের ঘটনায় এই প্রশ্নের একটা উত্তর দিয়েছে কাশ্মীরের চলমান যুব-বিদ্রোহ। বুরহানের বাবার বর্ণনাতেও একটা উত্তর পাওয়া যায়। ফেসবুক পোস্টে বারামুল্লার সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ ইমতিয়াজ হুসেন বলেছেন, বুরহান কোনো সশস্ত্র অ্যাকশন করেনি। দক্ষিণ কাশ্মীরের একজন পুলিশ অফিসার বলেছেন, বুরহানকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছিল। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় মুজামিল জলিল বলেছেন, ওরা শুধু অনন্তনাগে মুখ্যমন্ত্রীর দলের নির্বাচন জেতার অপেক্ষায় ছিল। তারপরই ওদের দৃষ্টি চলে যায় বুরহান ওয়ানির ডেরার দিকে। ...

যদিও এখন সমস্ত জাতীয় সংবাদমাধ্যম স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সরবরাহ করা 'এনকাউন্টার' শব্দের প্রতিধ্বনি করে চলেছে।

*

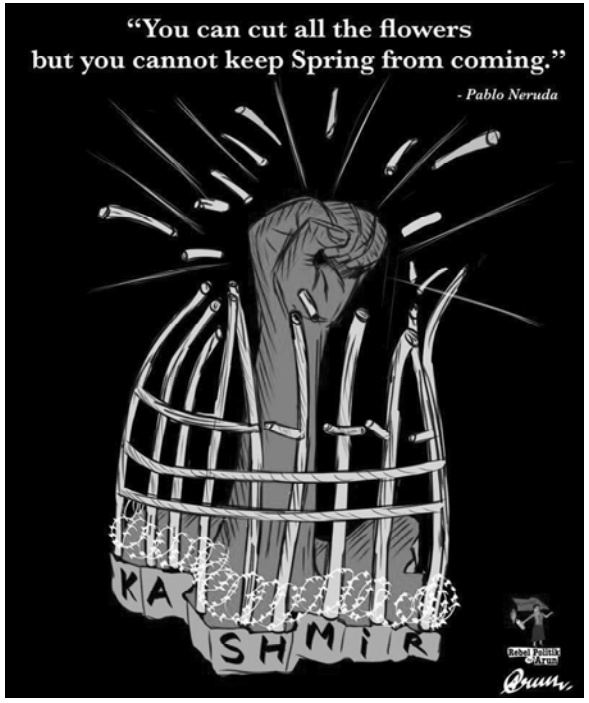

প্রকাশকের কথা

কাশ্মীরের মানুষ কী চায়, সেকথা শুনতে হবে ভারত সরকারকে। কাশ্মীরিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাদের। নচেৎ কাশ্মীর উপত্যকায় এই হিংসা চলতেই থাকবে। তিন দশকে যে এক লক্ষ মানুষ সেখানে মারা গেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে সামরিক বাহিনীর জওয়ান এবং পুলিশেরাও। বুরহান ওয়ানির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যে বিদ্রোহ, তাকে দমন করতে গিয়েও একজন পুলিশ-কর্মী নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছে দেড় হাজারের বেশি নিরাপত্তা রক্ষী। সম্প্রতি ২৫ জুন ২০১৬ শ্রীনগরে একটা সিআরপিএফ বাসের ওপর হামলা করে ৮ জন জওয়ানকে হত্যা করেছে যারা, তাদের এই কাজ নিন্দনীয় এবং দুঃখেরও বটে। প্রত্যেকটি জীবনই সমান মূল্যবান, তা আমরা এইভাবে হারাতে চাই না। একমাত্র আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার পথেই কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান হতে পারে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে শান্তি ফিরে আসতে পারে। অথচ আজও ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলে চলেছেন, তাঁরা পাকিস্তানের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত, কিন্তু 'কেবল ভারত ও পাকিস্তান দুই পক্ষই আলোচনায় থাকবে'। অর্থাৎ সরকার কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থানকে আমল দিতে চায় না। বুরহান ওয়ানির বাবা মুজফ্ফর ওয়ানি বলেছেন, 'ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর কাশ্মীর এই তিন পক্ষকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করাতে হবে। দুই পক্ষ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবে না। আমাদের এর অংশীদার করতে হবে।' এ কেবল একজন ব্যক্তির মত নয়, প্রতিটি কাশ্মীরি হৃদয় জুড়ে রয়েছে এর অস্তিত্ব। কী করে আমরা তা মুছে দিতে পারি?

*

বুরহান ওয়ানির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে
বিদ্রোহী কাশ্মীর

প্রকাশকাল ১৫ জুলাই ২০১৬

প্রকাশক মন্থন সাময়িকী
বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা
কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ ০৩৩ ২৪৯১৩৬৬৬
ই-মেল manthansamayiki@gmail.com

লেখক জিতেন নন্দী (সমস্ত উদ্ধৃত অংশের বাংলা তরজমা সহ)

মুদ্রণ প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য ১০ টাকা